আলো পথ
এমএলই নিউজলেটার
ষষ্ঠদশ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৭

এমএলই ফোরামের ৪০তম সভা

গত ২৭ এপ্রিল বহুভাষিক শিক্ষা ফোরাম ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর যৌথ উদ্যোগে ফোরাম-এর ৪০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি।

সভায় প্রধান অতিথি ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি বলেন, সাঁওতাল ভাষা চর্চা দীর্ঘদিনের বিষয়। ধীরে ধীরে এ ভাষা লিপিতে পরিণত হয়েছে। এ ভাষার লিপি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল ভাষা অলচিকি লিপিতে করা হলেও পরে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আমরা নব্বই দশকে বাংলা ভাষায় স্কুল করেছি, তারা এখন উচ্চ শিক্ষায় পড়াশোনা করছে। আবার অনেকেই রোমান হরফ ব্যবহার করে সাঁওতাল ভাষা পড়ছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। আমরা এখন লিপি বিতর্কে সামগ্রিক সমস্যায় জড়াব কি না সেটাও একটা প্রশ্ন।

সবকিছু বিবেচনা করে তিনি বাংলা ও রোমান দুটো ভাষাতেই শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। বাংলা ও রোমান একই পুস্তকের মধ্যে (দুই ভাষায়) প্রাক-প্রাথমিক থেকে শিক্ষা শুরু করা যেতে পারে। সাওতাঁল হলো বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী। যদি লিপি বিতর্কের অবসান হয় তা হলে উচ্চ শিক্ষায় এ ভাষায় অনার্স কোর্স চালু করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. জানুয়ারি ১৭ সালে আদিবাসী শিশুদের হাতে ৫টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়ার জন্য এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া। সেখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ৫টি ভাষার বাইরে অন্যান্য ভাষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

২. এমএলই ফোরাম কর্তৃক সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লিপি নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা করা। এ জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।

৩. মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ে গঠিত বিভিন্ন টেকনিক্যাল কমিটিকে সহায়তা করা। আদিবাসী শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণির উপকরণ উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৪. মডেল শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যায় কি না সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

মারমা জাতির উৎসব

সাংগ্রাঁই

মারমা জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব হলো সাংগ্রাঁই উৎসব। বর্ষ বরণ এবং বর্ষ বিদায় উপলক্ষে মারমারা তিন দিনব্যাপী সাংগ্রাঁই উৎসবের আয়োজন করে। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন এবং নববর্ষের দিন সাংগ্রাঁই উৎসব উদযাপিত হয়। এই তিন দিনের আলাদা আলাদা নাম আছে। নামগুলো হলো : ১. সাংগ্রাঁই আকিয়ানিহ (আক্যাহ্নিহ্), ২. সাংগ্রাঁই আক্রাইনিহ, ৩. সাংগ্রাঁই আপ্যাঁইনিহ্।

সাংগ্রাঁই আক্যাহ্নিহ্ উদযাপিত হয় ৩০ চৈত্র। ঐ দিন ভোরের দিকে বিছানাপত্র নিয়ে উপসথ পালনার্থে বিহারে গমন করেন বয়স্ক পুরুষরা। এদিন বিকেলে মারমা জাতির লোকসকল আনুষ্ঠানিকভাবে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নদীর ঘাটে নিয়ে আসেন। নদীর চরে/পাড়ে সজ্জিত মঞ্চে মূর্তিটি বসিয়ে চন্দন পানি এবং দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। অতঃপর মূর্তিটিকে আবার যথাস্থানে রেখে আসেন। যেখানে নদী নেই সেখানে মন্দিরে বুদ্ধ মূর্তিকে স্নান করানো হয়। সাংগ্রাই আক্রাইনিহ এবং সাংগ্রাঁই আপ্যাঁইনিহ উদযাপিত হয় ৩১ চৈত্র এবং ১ বৈশাখ। এ দুদিন মারমা জাতির লোকসকল খুব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে কাটায়। এ সময় পাড়ায় পাড়ায় চলে পানি খেলা। পুরানো বছরের দুঃখ, গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে দিয়ে মৈত্রী পানি বর্ষণের মাধ্যমে নূতন বছরকে বরণ করে নেয়। আগামী বছর সুখ শান্তিতে পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছায় একজন অন্যজনকে পানি ছিটায়। বান্দরবান শহরে মঞ্চ তৈরি করে নৌকা ভর্তি পানি নিয়ে মারমা ছেলে মেয়েরা পানি খেলায় মেতে ওঠে। দূরবর্তী মারমা জাতির লোকসকলের মধ্যে সাধারণত এর তেমন প্রচলন নেই। বার্মা থেকে ফিরে আসা বোমাং কয়েকজন যুবক স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পরে বান্দরবানে প্রথম এই পানি খেলা উৎসবের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে 'সাংগ্রাঁইআকা' নামে যে নৃত্য গীত হয় তার গীতিকার হচ্ছেন বোমাং রাজ পরিবারের সদস্য উ: পঁইঞ্যা জোত মহাথেরো। এসব নৃত্য গীতে বার্মিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ আছে।

মারমা জাতির লোকসকল এসময় মন্দিরে প্রার্থনা করেন। প্রবীণদের যত্ন করে স্নান করিয়ে পূণ্য আদায় করেন। মারমা জাতিসত্তা নববর্ষকে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করেন। সাংগ্রাঁই অনুষ্ঠান শুরুর আগে থেকে মারমা কিশোরী-যুবতী-বয়স্ক নারীরা নিজ নিজ বৌদ্ধ মন্দির ধোয়া মোছা করে। সে সঙ্গে নিজের বাড়ি ঘর এমনকী পোশাক-পরিচ্ছেদ ধুয়ে পরিষ্কার করে। এ কারণে সবখানে সাজ সাজ রব পড়ে। মারমা জাতি সাংগ্রাঁই উৎসবে যে নৃত্যগীত করে এর কয়েকটি পংক্তি হলো ;

সাংগ্রাঁইমা ঞিংঞিংঞ্যাঞ্যা রিকাজাইগাইপামে

ও---- ঙিংকোরো, ও--- আমে মারি:রোহ্

লাগাই লাগাই -লাগাই লাগাই-লাগাই লাগাই

চুহ্প্যগাইমেলে:। --ঐ--

(শুভ নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে জল উৎসব করি,

এসো ভাই, এসো দিদিরা আমরা সবাই আজ একত্র হই।)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এলাকাভেদে সাংগ্রাঁই উৎসবের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। এটা অনেক সময় আর্থিক সক্ষমতার উপরও নির্ভর করে।

কুমার প্রীতীশ বল

রাখাইন জাতির কথা

বাংলাদেশের ৪৫টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। রাখাইন সম্প্রদায় এরকম একটি জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সাগর পাড়ের জেলা পটুয়াখালী ও বরগুনায় এদের বসবাস বেশি। এছাড়া পার্বত্য এলাকায়ও এরা বসবাস করে, তবে সংখ্যায় কম। রাখাইনদের আদিবাস বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে। আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের অঙ্গরাজ্য হলেও একসময় এটি ছিল স্বাধীন দেশ। ১৭৮৪ সালে বর্মারাজা আরাকান দখল করার কারণে এরা দেশ ত্যাগ করে। ১৫০টি পরিবার বর্মী রাজার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় ৫০টি নৌকা যোগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে, অবশেষে তিন দিন তিন রাত পর বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলার হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্য ভূমির বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে পৌছায়। হিংস্র জীবজন্তর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাখাইনরা এসব অরণ্যভূমি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে সঙ্গে আনা ধান ও অন্যান্য বীজ বপন করে ।

রাখাইনদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথা বলে। শিক্ষার হার বর্তমানে সন্তোষজনক। রাখাইনদের রয়েছে নিজেদের ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এদের ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলে কিয়াং। সাধারণত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কিয়াং এ পাঠদান করে থাকেন । এদের সংস্কৃতিতে রয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য। রাখাইনদের রয়েছে নিজস্ব আচার-প্রথা। এদের বড় বড় সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে -প্রবারণা পূর্ণিমা , মাঘী পূর্ণিমা, জলকেলী (লেই খেখু), নববর্ষ, কঠিন চীবরদান, বিয়ে। রাখাইন সম্প্রদায়ের বিয়ে উৎসব, মৃত্যুর পরে সৎকার অনুষ্ঠানে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে।

রাখাইনদের আর একটি বড় উৎসব হল লেই খেখু । তিন দিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষ বরণের মতো এই অনুষ্ঠানের তিন দিনই রাখাইনরা আকর্ষণীয় পোশাক পরে। বাড়িতে খাবার রান্না করে। আত্নীয়-বন্ধুদের পরিবেশন করে। নারী-পুরুষ সবাই দল বেঁধে ঘোরে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি পানি ছিটিয়ে আনন্দ করে। নাচ গান হয় । এ অনুষ্ঠানের সময় অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে ভাবের আদান - প্রদান হয়। এ থেকে হয়ে যায় জীবনসঙ্গী।

বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ার জন্য দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান হলো কঠিন চীবরদান। বেশ জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর শুরু বা সমাপ্তি হয়। এ অনুষ্ঠানে সবাই উপস্থিত থাকে। থাকে ভোজের ব্যবস্থা। সৃষ্টিকর্তার (ফারাতার) কাছে মঙ্গল কামনা করা হয়।

মৃত্যুর পরে অনেক সময় মৃত ব্যক্তির দেহকে সংরক্ষণ করা হয়। পরে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির দেহকে বারুদের মাধ্যমে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাবা হয় এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির দেহকে সৃষ্টিকর্তার কাছে বা স্বর্গে পাঠানো হয়েছে। ৫/৭ দিন ধরে চলে এই উৎসব। থাকে গান, সৃষ্টিকর্তার (ফারাতার) কাছে মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা।

রাখাইনরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী। এদের রীতি অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে বাবা-মায়ের সম্পত্তির সমান ভাগ পায়। রাখাইন পাড়াগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গড়ে ওঠে। রাখাইন সমাজের দানশীল ব্যক্তি বা নেতাদের নামানুসারে পাড়ার নামকরণ করা হয়। অন্যান্য রাখাইন পরিবার এখানে এসে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসতি স্থাপন করে। একটি পরিবার থাকা পর্যন্ত এই সম্পত্তি কেউ বিক্রি করতে পারবে না। পাড়ার নেতা বা মাতব্বর নির্বাচন করা হয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, প্রত্যক্ষ ভোটাভুটির মাধ্যমে। পাড়ার সকল পুরুষ একত্রিত হয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে পাড়ার হেডম্যান বা নেতা বা মাতব্বর নির্বাচন করে থাকে। তবে রাখাইন স্বার্থবিরোধী কাজ করলে মাতব্বর অপসারণ করে নতুন মাতব্বর নিবার্চন করা হয়। নেতা বা মাতব্বর নির্বাচনে নারীদের কোনো ভূমিকা নেই। নারীদের ভোট দানের ক্ষমতা নেই।

২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচটি আদিবাসী ভাষার (চাক
পেয়েছে। এর ফলে আদিবাসী সমাজে কী ধরনের প্রভাব পরেছে এবং ভবিষ্যৎ করণী

বাঁধন আরেং
গারো ভাষার লেখক

পহর: *এনসিটিবি কর্তৃক আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাইমার রচয়িতা হিসেবে আপনি কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন?*

বাঁধন আরেং: দীর্ঘ দিন ধরে এমএলই ফোরামের সঙ্গে কাজ করছি। মাতৃভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছি, লেখালেখি করেছি। মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে গারো আদিবাসীদের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে কাজ করেছি। সবশেষে এনসিটিবি'র আহ্বানে গত বছর গারো শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ে ৮টি উপকরণ তৈরির কাজও অন্য সদস্যদের সঙ্গে করেছি।

পহর: *আপনার এলাকায় এ বছর আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে কি? এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অনুভূতি কী ?*

বাঁধন আরেং: আমার জানা মতে, একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গারো আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পেয়েছে কি না নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে খুবই সীমিত সংখ্যক শিক্ষা উপকরণ পৌঁছেছে। এর মধ্যে গল্পের বই পৌঁছেনি। প্রথম দিকে বেসরকারি পর্যায়ে যখন মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল, তখন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। কিন্তু সরকারিভাবে ছাপা ও প্রকাশিত বই পেয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তেমন উচ্ছ্বাস বা আবেগ লক্ষ করা যায়নি।

পহর: *আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পাওয়াতে তাদের কী কী ধরনের উপকার হবে বলে আপনি মনে করছেন?*

বাঁধন আরেং: আদিবাসী শিশুরা স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করবে এতেই সবচেয়ে বড় উপকার হবে। শিশু মনের ভাবনাগুলো নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। মাতৃভাষার সহায়তায় শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠবে যা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে।

পহর: *আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আপনার আর কোনো করণীয় আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন।*

বাঁধন আরেং: আমরা দীর্ঘদিন ধরে মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ে কাজ করছি এবং শিখছি। বর্তমানে সরকারিভাবে কাজটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও নীতিনির্ধারকদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কাজ চলতে থাকবে। মাঠে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন এবং জাতীয় পর্যায়ে যে সব দায়িত্ব পালন করা দরকার সে সব আমরা করে যাব। কাজগুলো সকলে মিলে করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে একজন লেখক হিসেবে লেখার কাজ চালিয়ে যাব। শিশুদের জন্য লেখার কাজ চালিয়ে যাব।

পহর: *উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আপনি আর কিছু বলতে চান কী?*

বাঁধন আরেং: গারো শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে উপকরণ তৈরির কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করি। সুযোগ দানের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা একটি জাতীয় কাজ। কাজটি সফল করার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ধন্যবাদ।

ক সম্পর্কে অভিমত

া, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ
য় সম্পর্কে জানিয়েছেন এসব পাঠ্যপুস্তক রচনায় জড়িত আদিবাসী শিক্ষা বিশেজ্ঞরা ।

যোগেন্দ্র নাথ সরকার

সাদরি ভাষা

পহর: *এনসিটিবি কর্তৃক আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাইমার রচয়িতা হিসেবে আপনি কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন?*

যোগেন্দ্র নাথ সরকার: প্রাথমিক পর্যায়ে সাদরি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য হামার বই, আওয়া লিখে শিখবেই, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট, ফ্লিপ চার্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা (ছড়া,গান,গল্প) ও গল্পের সেটে ৬ টি গল্প ভাষান্তর ও ৪ টি গল্প সাদরি ভাষায় লেখা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের সাদরি ভাষায় রচিত উপকরণসমূহ সংশোধন করে সংশোধিত স্থানসমূহে অনুস্বাক্ষর এবং বইয়ের পাতায় পাতায় স্বাক্ষর ও নামের সীল প্রদানপূর্বক এনসিটিবির শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখায় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে জমা দিয়েছি। তাছাড়াও সাদরি ভাষা টীমের সমন্বয়কারী, এনসিটিবি'র বিষেশজ্ঞ ও এনসিটিবি'র উর্দ্ধতন বিষেশজ্ঞ কর্তৃক পরামর্শ ও নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেছি।

পহর: *আপনার এলাকায় আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে কি? এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অনুভূতি কী?*

যোগেন্দ্র নাথ সরকার: আমার এলাকা সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ উপজেলায় এ পর্যন্ত (০৪/০৩/২০১৭) আদিবাসী শিশুরা এনসিটিবি কর্তৃক মাতৃভাষায় রচিত কোনো পাঠ্যপুস্তক পায়নি, মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক পেলে আদিবাসী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুভূতির কথা জানা যেত, দুভার্গ্য যে লেখক প্যানেলের সদস্য হিসেবে সে সুযোগ থেকে আমিও বঞ্চিত হলাম।

পহর: *আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পাওয়াতে তাদের কী কী ধরনের উপকার হবে বলে আপনি মনে করছেন?*

যোগেন্দ্র নাথ সরকার: মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার আনন্দ বলে বুঝানো কঠিন, যারা পড়বে তারাই শুধু এর আনন্দ উপভোগ করবে।

মাতৃভাষায় শিক্ষক যখন জানা শব্দ অথবা চেনা বস্তু নিয়ে কথা বলবে তখন সে অতি বিশ্বাসী হয়ে উত্তর দিবে।

মাতৃভাষায় শিক্ষক যখন পড়াবে অথবা কথা বলবে তখন সেই শিক্ষক তার কাছে অতি আপনজন বলে মনে হবে।

মাতৃভাষায় লেখাপড়ার ফলে শিশুর স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ বেড়ে যাবে এবং অন্য ভাষার প্রতি তার যে ভয় ছিল ধীরে ধীরে তা কমে যাবে।

বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতি বেড়ে যাবে এবং তারা নিয়মিত হবে।

পহর: *আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আপনার আর কোনো করণীয় আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন।*

যোগেন্দ্র নাথ সরকার: স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর এই সরকার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষায় কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া সরকারের মহতী উদ্যোগের বহিঃপ্রকাশ। সরকারের এই মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাকে আগামী দিনে সম্পৃক্ত রাখলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ্যসূচি আরো তথ্যবহুল ও মানসম্মত করব।

পহর: *উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আপনি আর কিছু বলতে চান কী?*

যোগেন্দ্র নাথ সরকার: (ক) মাঠ পর্যায় থেকে বইয়ের চাহিদা সংগ্রহ করার দায়িত্ব ছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। কিন্তু অনেক জেলা থেকে সাদরি ভাষার পাঠ্য বইয়ের চাহিদা ঠিকমতো পাওয়া যায়নি; আবার এমন হয়েছে যে জেলায় সাদরি ভাষার শিক্ষার্থী নেই, সেই জেলায় সাদরি ভাষার বই পাঠানো হয়েছে। যেমন আমার জানা মতে রাঙ্গামাটি জেলাতে সাদরি ভাষার শিক্ষার্থী নেই। অথচ সেখানে সাদরি ভাষার বই পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) মাঠ পর্যায়ে বই আসলেও দুই ধরনের সমস্যা হবে। প্রথমত, অনেক বিদ্যালয়ে সাদরি ভাষার ছাত্র/ছাত্রী আছে, কিন্তু উক্ত ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা নাই, তাহলে বইটি পড়াবে কে? দ্বিতীয়ত, বইটি যাঁরা পড়াবেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ নাই, তাহলে আদৌ ২০১৭ তে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি না?

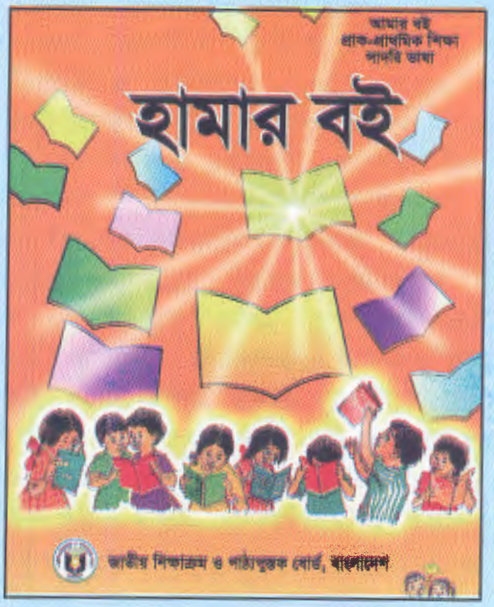

মাতৃভাষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর সাধারণ-অসাধারণ কোনো মানুষেরই চেতনায় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা বিতর্ক থাকার কথা নয় যে, পৃথিবী নামক গ্রহের প্রতিটি মানুষের তার মাতৃভাষায় বলা, লেখা ও চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। একদিক থেকে বললে আজকের দিনটি পর্যন্ত তাই-ই হয়ে আসছে। মাঝে মধ্যে দু'একটি সময় ও দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা ছাড়া। মাতৃভাষায় জীবন যাপনের দাবিতে বিশ শতকের পঞ্চম দশকে আজকের বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এবং ষাটের দশকে ভারতের বরাক উপত্যকার (আসামের শিলচর) বাংলাভাষীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। অতঃপর তারা অধিপতি প্রতিপক্ষের রোষানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বভাষা ও স্বজাত্যবোধের পরিচয় উৎকীর্ণ রেখেছে ইতিহাসের পাতায়। একদিক থেকে এ জাতীয় ঘটনাকে ইতিহাসের ব্যতিক্রমী অভিক্ষেপ বলে শনাক্ত করা চলে। অনেক ঐতিহাসিকও তাই বলেন। ভাষার অধিকার রক্ষার ব্যাপারটি যখন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ-নিপীড়নের পুঞ্জীভূত অবদমনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে শাসক বা ক্ষমতা-তখ্তের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে, তার বিচার-বিবেচনা হয়ে ওঠে ভিন্নমাত্রিক। সেই একই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি ষাট-বাষট্টি বছরের আগেকার তুলনায় অনেক বদলে গেছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের চেয়ে এখনকার বাংলাদেশের সকল স্তরের শিক্ষিত, সচেতন নাগরিক এদেশের সুদূর ঐতিহাসিককাল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ, সংবেদনশীল ও পারস্পরিক যোগাযোগ প্রত্যাশী হয়ে ওঠেছে। পাকিস্তানি আমলে যে-বিষয়টি ছিল পাথুরে দেয়ালের মতো অভেদ্য, অপরিচিত ও আগ্রহহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সুবাদে সে দেয়াল এখন অপসৃত, আলোকিত ও অনেকখানি প্রসারিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। গণমাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নতি ও বিস্তৃতি, একবিংশ শতকে তথ্যভাণ্ডারের অবারিত বিমুক্তি, সর্বোপরি, স্বদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা বৃদ্ধির বাস্তবতা ও তাদের জীবনধারার বৈচিত্র্য সংরক্ষণের আওয়াজ একালের নাগরিককে নিঃসন্দেহে ভাবায় দেশজ মানবসত্তাসমূহের ঐকতানে মাঙ্গলিক রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। আমার ধারণা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এই হলো এক লহমায় অনেক প্রাপ্তির যোগফলের একটি উজ্জ্বল সমীকরণ।

যে কোনো প্রাপ্তিই আরও বহুল প্রাপ্তির পাটাতন তৈরি করে। তৃপ্তির বৃত্ত ভাঙা আরও অগ্রসর পদচারণার প্রেরণা নিয়ে আসে। আত্ম-উপলব্ধির দিগন্ত প্রসারিত ও উন্মুক্ত করে দেয়। নতুনতর জীবন নির্মাণও সম্ভাবনার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে আরও। এ সবের কোনোটাই অদ্ভুতাত্মক, অনৈসর্গিক কিংবা অমানবীয় স্বভাব-চরিত্র নয়। এ তো জীবনেরই গতি, যাপনেরই অন্তর্গত উৎসার। এ নিরিখেই বাংলাদেশের আদিবাসী জনমানুষের ভেতর জন্ম নিয়েছে প্রথা ও লোকাচার, সংস্কৃতি ও জীবনাচার বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাচেতনার প্রসার, সে সবের প্রতি রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা দায়বদ্ধতা। এ প্রসঙ্গে এও স্মরণ করা দরকার, উল্লিখিত চেতনামথিত বিষয়গুলোর উন্মেষ ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক উন্নততর সংস্কৃতি বা জীবনযাপনের মিথষ্ক্রিয়ায়। অন্যথায় ওই প্রসঙ্গগুলো কিছু গুহামানবের চিরকালের অবদমিত অথচ ভাবিত বিলাপে পর্যবসিত হয়ে কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যেত। আদিবাসী সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, পাহাড় ও পাথরের গায়ে হয়তো তা উৎকীর্ণ হয়ে আছে আরও- যার পাঠোদ্ধার কোনো কালেই আর সম্ভব হবে না। কিন্তু যার রেশ রয়ে যায় যৌথ অবচেতনার ভেতর অলক্ষ্যেই। কাজেই আজকের সংক্ষুব্ধ, সমকালীন ভাব ঝড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল আদিবাসী তরুণ-যুবা কিংবা তাদের অগ্রজরা যখন আপন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের মাতৃজবান, পাহাড় ও ঝিরি-ঝরণার আবহে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত কিংবা প্রাণদানে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তখন তা সময়ের স্বভাবকে প্রতিহত করে না। বরং তাতে বীক্ষণ এভাবে প্রোথিত হয় যে, এ হলো নতুনকালের আচরণ, নতুন পৃথিবী ও নব তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে অভিযোজনের ঐকান্তিক উদ্ভাসন।

উত্তর-কাঠামোবাদীরা (পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট) বলছেন, একটি বড় কোনো শামিয়ানার নিচে সকল মানুষকে একীভূত করে রাখার বিংশ শতকীয় কিংবা তার পূর্বেকার দৃষ্টান্তের আর কোনো কার্যকারিতা এখন আর নেই। প্রত্যয়ের ভেতর মানুষের মধ্যে প্রাপ্তব্য সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি যৌক্তিক পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়েছে। যেখানে জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক-এমনকি স্থানিক স্বাতন্ত্র্যের কথাও অনুক্ত থাকে না। সম্ভবত ওই দার্শনিক অভিঘাতের আদলেই ফিলিপাইন, ভারত, বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে সেসব দেশস্থিত আদিবাসীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার তাগিদে নানা পরিপ্রেক্ষিতের চুক্তি বা সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

হাফিজ রশিদ খান

সাঁওতাল ভাষা
হুল

ভারত দিশীমরেন আঁদ মানওয়া'দকো হয়োঃক্' কানা হড় হোপনগে। মেনখান নোআঃ সুখ আঁড়িযুগ বাঁং গীডয়াঁউলেন তাকোআঃ। হড় হোপনাঃক্' ধন ঞেলতে জমিদার, পুলিশ, দারোগা আর দিকো মাহাজন যত মিতকাতে হড়কো ঠক আর এড়েকেত কোওয়া। সানাম জমি জাগা মিহু মেরম গাই কাডাকো এড়ে অচোয়েনা। দিশীম হড়কো আক-বাকাওয়েএনা। উনরে ভগনাডি আতোরেন সিদু, কানু ঢারুয়া'কাতে দিশীম হড়কিন জাওরাকেত কোয়া। মারাং বাইসি হোয়ায়েনা।

মিত সময় বাংলা দিশীম পাকিস্তানরেয়াক কুটরীতেত তাঁহেকানা। উনসময় বাংলাদেশীম রেয়াক্' ঞতুম তাহেঁকানা পূর্ব পাকিস্তান। পাকীস্তানী শাসককো পূর্ব পাকিস্তান'দ আকোয়াক্'। উপনিবেশ মেনতেকো লেখায়েত তাহেঁনা। অনাতে নোয়া দিশীম'দকো রেনজেত এত তাহেঁনা।

দিশীম হড়কো চেতারে আড়িলেকান হারকেত শাসেত'কো চালাও কেদা। আরকো মেনকেদা-নোয়া দিশীম-রেয়াক্' পার্শি'দ হয়োক'আঃ উর্দু। ইনহিলোক্' নোআঃ দিশীমরেন কোড়াকো নোআকাথাকো তারকো রুয়াঁড়কেদা।

তায়মতে ১৯৭১ সালরে বাংলাদিশীমরেন'কো সাঁও পাকিস্তানীয়াক্' লাঁড়হাই লাগাওয়েনা। নোআ লাড়হাই রেয়াক্' ঞুতুম'দ মুক্তিযুদ্ধ নোআ মুক্তিযুদ্ধরে হড়পড়নকো সেলেত লেনা। ১৯৭১ সাল ১৭ এপ্রিল দিনাজপুর জেলা রেয়াক্ ভুষিরবন্দরে খান সেনাকো সাঁও হড়হপনাঃক্' খাদ-বাদ লাড়হাই হোয়লেনা। খান সেনাকো সাঁও লাড়হাইরে মিতবার হড়কো গুরলেনা। পাঁচ এনাকো, মেনখান ইনহিলৌক গোটা দিনাজপুররেন জনগনকো লাগিত নোআঃগে তাহেঁকানা খান সেনাকো বিরুদরে পাহিল মুক্তিযুদ্ধ'দ।

ইনাতায়ম হড়হপন ভারত দিশীমরেকো শারনার্থীয়েনা। নিয়া অকতে মুক্তি বাহিনীকো হোয়য়েনা। আডিউতার হড়কোড়া মুক্তি বাহিনীতেকো বলোয়েনা। রাজশাহীরেন সাগরাম মাঝি কয়েক'শ হড়কোড়া নিয়া মুক্তিবাহিনী দল-এ গঠন কেদা। উতার এলাকারে আডি আয়মা লাড়হাই ঠাঁরে হড় মুক্তিযোদ্ধা লাড়হাইরেকো শেলেতলেনা। নয়চান্দো লাড়হাই হোয়লেনা ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন-এনা। জানাম দিশীম আর হড় মুক্তিযোদ্ধাকো লাগিত হড়হপনাঃ মনঅন্তরদ বুরুলেকা মারাংকো ইয়কাউআ।

অধ্যাপক গণেশ সরেণ

বাংলা ভাষা
সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতালরা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী। মনের আনন্দে তারা জীবনযাপন করত। কিন্তু তাদের এ সুখ স্থায়ী হলো না। স্থানীয় জমিদার, মহাজন, পুলিশ, দারোগা একযোগে শোষণ ও নির্যাতন করতে লাগল।

এ সময় ভগনাডি গ্রামের সিদু-কানু, চাঁদ, ভায়রো নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তারা চারদিকে সংবাদ পাঠিয়ে সমাবেশ ডাকলেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত হয়, তারা বিদ্রোহ করবে। এ বিদ্রোহে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল যোগ দেয়। তারা স্থানীয় জমিদার, মহাজন, নীলকুঠি ও রেনাম কুঠি'র সাহেবদের হত্যা করে সমগ্র দামিন-ই-কো অঞ্চল দখল করে।

পরবর্তী সময়ে ইংরেজ বাহিনী কামান-বন্দুক নিয়ে সমগ্র সাঁওতাল এলাকা ঘিরে ফেলে। নির্বিচারে পুরুষ, নারী ও শিশু হত্যা করে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। সাঁওতালদের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড গেরিলা লড়াই হয়। তাদের মধ্যে পিয়ালাপুরের যুদ্ধ অন্যতম। এ যুদ্ধে সিধু, চাঁদ ও শাম পারগানাসহ কয়েক হাজার সাঁওতাল নিহত হয়। দামিন-ই-কোর লালমাটি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়। সাঁওতালরা পরাজিত হয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। কয়েক মাস পরে আবার সাগ্রামপুরে ভীষণ লড়াই হয়। এ লড়াইয়ে কানু, ভায়রোসহ অনেক নেতা ধরা পড়েন। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে সিউড়ির মাঠে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। কানু, ভায়রোসহ অবশিষ্টদের ভগনাডি গ্রামে বটগাছে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালরা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। অসীম সাহস ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে সাঁওতালরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল দিনাজপুর ভূষিরবন্দরে সেনাদের আধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে সাঁওতালরা তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধে কয়েকজন সাঁওতাল শহীদ হয়। সেদিন দিনাজপুরের সমগ্র জনগণের পক্ষে এটাই ছিল পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ।

সাঁওতালরা বাঙালিদের সঙ্গে ভারতের শরণার্থী হয়। এসময় তারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। রাজশাহীর সাগরাম মাঝি কয়েকশ সাঁওতাল যুবক নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। উত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন ফ্রন্টে সাঁওতাল মুক্তিবাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অনেকে শহীদ হয়। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সাঁওতালরা গর্ববোধ করে।

অধ্যাপক গণেশ সরেণ

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কান্ত ত্রিপুরা

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে মুক্ত করতে অসামান্য অবদান রেখেছেন মুক্তিযোদ্ধা কান্ত ত্রিপুরা। আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কান্ত ত্রিপুরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদমে পাহাড়ি জনপদ বাবু পাড়ায় বসবাস করেন। এক সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সনদ থাকলেও এখন তা বেহাত হয়ে গেছে।

মেজর হেমন বাবুর অধীনে কান্ত ত্রিপুরা মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭৫জনের মুক্তিবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে ভারতের ফারশুয়া ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা ভারতের কাছ থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল পান। একটানা ২৭ দিন প্রশিক্ষণ শেষে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আসেন। ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর টিএম আলীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। রোয়াংছড়ি উপজেলার কানাইজো পাড়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্রশক্তি ভারতের মিজোরামের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের বিরুদ্ধে সুবেদার মেজর টিএম আলীর নেতৃত্বে একটি সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। ১০ থেকে ১২ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩০ জন শহীদ হন এবং শত্রু পক্ষের একজন মারা যায়। এ সম্মুখ যুদ্ধে কান্ত ত্রিপুরাসহ আটজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা কান্ত ত্রিপুরা সবার নাম স্মৃতিতে ধরে রাখতে না পারলেও সুচিমং মার্মা ও লাইংগ্যা বম নামে দু'জনের নাম মনে রাখতে পেরেছেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে তাঁরা চট্টগ্রাম জেড ফোর্সের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানের হাতে অস্ত্র জমা দেন।

মুক্তিযোদ্ধা কান্ত ত্রিপুরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ পাওয়া মূল সনদের কপিটি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে একটি আর্থিক সাহায্য আবেদনের সঙ্গে জমা দেন ৫ থেকে ৬ বছর আগে। অসচেতনতাবশত তিনি ফটোকপি রাখেননি। এখন ভিলেজার হিসেবে মাতামূহুরি রেঞ্জের বাবু পাড়ায় একখণ্ড জমিতে তৈরি করা দু'চালা একটি ভাঙা মাচাং ঘরে ষাটোর্দ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে অসহায় এ মুক্তিযোদ্ধার দিন কাটছে। বর্তমানে তিনি মানবেতর জীবন যাপন করছেন। দেশ স্বাধীন হলেও দেশের কোথাও নিজের নামে একখণ্ড জমি নেই। বর্তমানে তিনি বয়সের ভারে চোখের দৃষ্টিশক্তিও হারাতে বসেছেন। মুক্তিযোদ্ধা হলেও জীবিকার তাগিদে এখন তিনি দিনমজুর। ১৫ থেকে ১৬ বছর আগে মাসিক পাঁচশত টাকা করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানী ভাতা পেতেন। সনদ হারানোর কারণে এখন সে ভাতাও বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেও মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম উঠাতে পারেননি।

জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার মো. সেলিম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, 'কান্ত ত্রিপুরা একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। কান্ত ত্রিপুরা সুবেদার মেজর টিএম আলীর সহযোদ্ধা হিসেবে রোয়াংছড়ির কানাইজো পাড়ায় সংগঠিত হানাদার বিরোধী সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছিলেন।'

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার পহর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান - এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় অঙ্গীকার প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

European Union